

পাখিদের বাসা

পাখি! তাদের উজ্জ্বল রঙ দিয়ে তারা আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়! তাদের গানের সুরে তারা আমাদের মন ভালো করে দেয়! আর ওহ, তারা কী চমৎকার সব বাসা তৈরি করে!

বেশিরভাগ পাখি তাদের বাসাতেই বসবাস করে না। তারা মূলত তাদের ছানাদের জন্যই বাসা তৈরি করে। তারা বাসাতেই ডিম পাড়ে এবং সেগুলোতে তা দিয়ে উষ্ণ রাখে। সেখানেই তারা ছানাদের খাইয়ে-দাইয়ে বড় করে। ছানারা উড়তে শেখার মতো বড় না হওয়া পর্যন্ত বাসাতেই অবস্থান করে। এরপর পুরো পরিবারটিই উড়ে চলে যায়।

কিছু পাখি বছরের পর বছর ধরে তাদের পুরনো বাসাই পুনরায় ব্যবহার করে। কিন্তু কাকের মতো অনেক পাখিই প্রতি ঋতুতে নতুন করে বাসা তৈরি করে। একারণেই আমরা প্রায়ই কাকদের ঠোঁটে ছোট ছোট ডালপালা বয়ে নিয়ে যেতে দেখি। নিরাপত্তার স্বার্থে, তারা গাছের যতটা সম্ভব উঁচুতে তাদের বাটির মতো দেখতে বাসাগুলো তৈরি করে।



আপনি কি জানেন যে, সব পাখির বাসা বাটির মতো দেখতে হয় না? আসলে বহু রকমের বাসা রয়েছে। কোনো কোনো বাসা সেলাই করে তৈরি করা হয়। কোনোটা আবার বুনন করে তৈরি হয়। আর কোনো কোনো বাসা তো স্রেফ মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তৈরি করা হয়!



টুনটুনি বা দর্জি পাখি (Tailor bird) সেলাই করে তার বাসা তৈরি করে। এটি গাছের দুটি ঝোলানো পাতায় ছিদ্র করে এবং সেই ছিদ্রগুলোর ভেতর দিয়ে গাছের আঁশ বা তন্তু ঢুকিয়ে পাতা দুটিকে জুড়ে দেয়। বাসাটি তার চারপাশের পাতার সাথে এতটাই মিশে থাকে যে, আমরা পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারি না!



আর বাবুই বা তাঁতি পাখি (Weaver bird) কীভাবে তার বাসা তৈরি করে? এটি গাছের ডালের আগায় একটি শক্ত গিঁট বাঁধে। এরপর এটি গাছের আঁশ দিয়ে বুনে বুনে একটি বিশাল গোলাকার কাঠামো তৈরি করে। তৈরি হয়ে যাওয়ার পর বাসাটি দেখতে ঠিক একটি উল্টানো কলসির মতো লাগে। এর লম্বা সরু মুখটি নিচের দিকে শূন্যে ঝুলে থাকে, যাতে কোনো শিকারি প্রাণী বাসার ভেতরে ঢুকতে না পারে।

কাঠঠোকরা (Woodpecker) এবং ধনেশ (Hornbill)-এর মতো কিছু পাখি গাছের কোটর বা গর্তকে তাদের বাসা হিসেবে ব্যবহার করে। ওহ, ধনেশ পাখি! আপনি কি কখনো ধনেশ দেখেছেন? এর মাথার ওপর একটি বড় কমলা রঙের ঝুঁটি বা টুপি থাকে এবং ঠোঁটটিও হয় লম্বা ও কমলা রঙের। যখন এটি ওড়ে, তখন এর ডানার ঝাপটানোর বেশ জোরে শব্দ হয়। এটি একটি সাহসী পাখি—আর সেই সাথে নিজের বাহাদুরি দেখাতেও খুব পছন্দ করে!

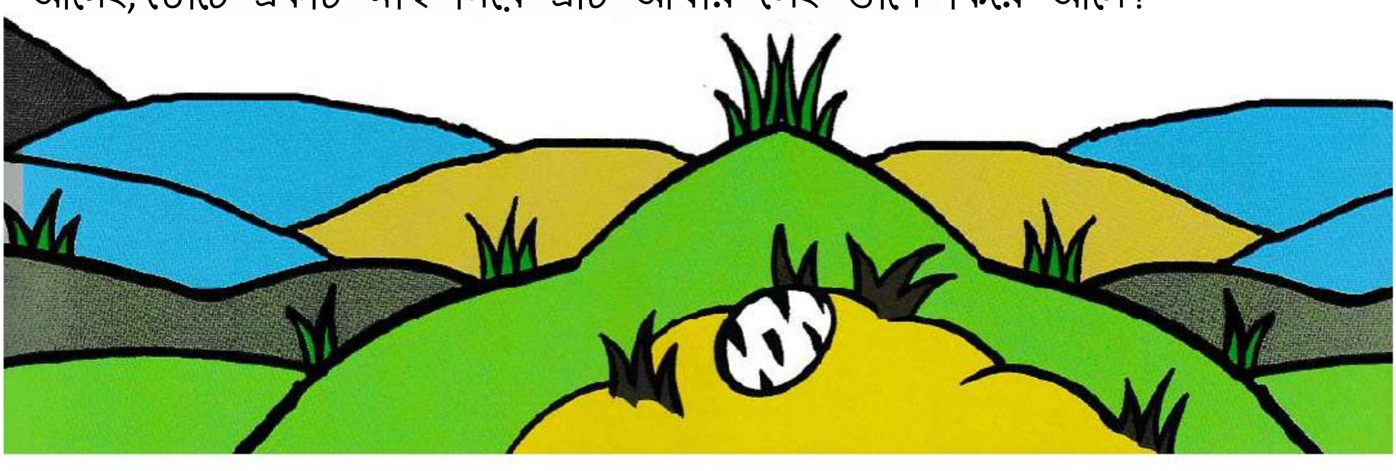


যখন মা ধনেশ ডিম পাড়ার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন সে গাছের কোটরের ভেতরে প্রবেশ করে। বাবা পাখিটি বাসার প্রবেশপথটি দেয়াল তুলে বন্ধ করে দেয়; তবে বাতাস চলাচল এবং খাবার দেওয়ার সুবিধার্থে সেখানে একটি ছোট ছিদ্র খোলা রাখে। ছানারা বড় না হওয়া পর্যন্ত মা পাখিটি বাসার ভেতরেই অবস্থান করে। যখন সে বাবার সাথে খাবার আনার কাজে সাহায্য করার জন্য দেয়াল ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসে, তখন ছানারা নিজেরাই বাসার ভেতরের আবর্জনা ব্যবহার করে সেই দেয়ালটি পুনরায় তৈরি করে ফেলে।

কী অদ্ভুত ব্যাপার, তারা যেন সহজাতভাবেই জানে যে তাদের ঠিক কী করতে হবে! সব পাখি কি নিজেরাই বাসা তৈরি করে? না, তারা তা করে না! কোকিলের (Cuckoo)মতো কিছু পাখি অন্য পাখির বাসায় ডিম পাড়ে। এমনকি কিছু পাখি তো মাটিতেই ডিম পাড়ে!



পাখিদের মধ্যে অন্যতম বিস্ময়কর একটি পাখি হলো মাছরাঙা (Kingfisher); এরা মাটিতে বাসা বাঁধে। আপনি কি কখনো মাছরাঙাকে মাছ ধরতে দেখেছেন? এটি গাছের নিচু কোনো ডালে বসে থাকে এবং জলের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎই এটি জলে ঝাঁপ দেয়—আর আপনি ‘এক, দুই, তিন’ গুনে শেষ করার আগেই, ঠোঁটে একটি মাছ নিয়ে এটি আবার সেই ডালে ফিরে আসে!

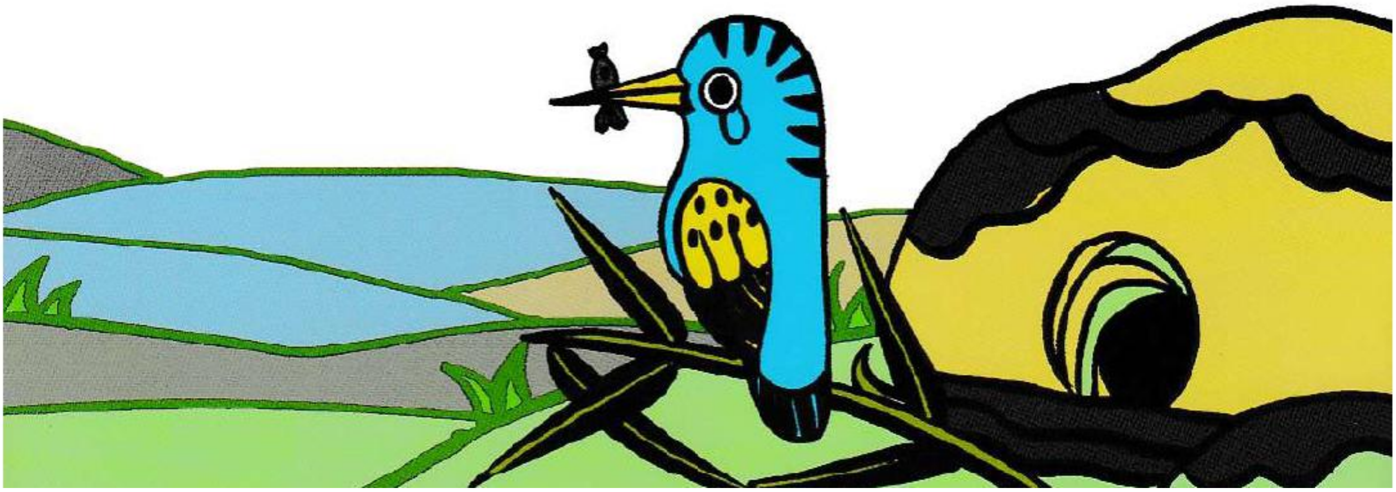




বাসা বাঁধার সময় মাছরাঙারা কোনো হ্রদ বা পুকুরের পাড়ে বালির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গ খুঁড়ে নেয়। ডিম পাড়ার পর, বাবা মাছরাঙা মা-পাখিকে ডিমগুলো তা দিতে বা উষ্ণ রাখতে সাহায্য করে। ডিম ফুটে ছানা বের হওয়ার পর, বাবা ও মা—উভয় পাখিই পালা করে ছানাদের জন্য খাবার নিয়ে আসে। বাবা-মা পাখি দুটি এভাবেই টানা চার মাস ধরে পরিশ্রম করে যায়!

পৃথিবীতে অসংখ্য চমৎকার ও আকর্ষণীয় পাখি রয়েছে। আমরা যদি একদম চুপচাপ স্থির হয়ে বসে তাদের পর্যবেক্ষণ করি, তবে তাদের সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারব।

আপনার বাড়ির আশেপাশে কোন কোন পাখি বাস করে?



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

Bengali Sriparna Tamhane

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Artist Uma Krishnaswamy

আমরা কারা?



এই ফলটি আসে নানা জাত ও রূপে—
সবুজ, হলুদ কিংবা লাল; গোলগাল বা সরু।
খোসা ছাড়ালেই মেলে এক চটজলদি নাস্তা—
যা মিষ্টি স্বাদের আর ভিটামিনে ভরপুর।

যেন সবুজ মার্বেল, কাঁচের সুন্দর গুলি—
লতানো গাছে থোকায় থোকায় ঝুলে আছে!

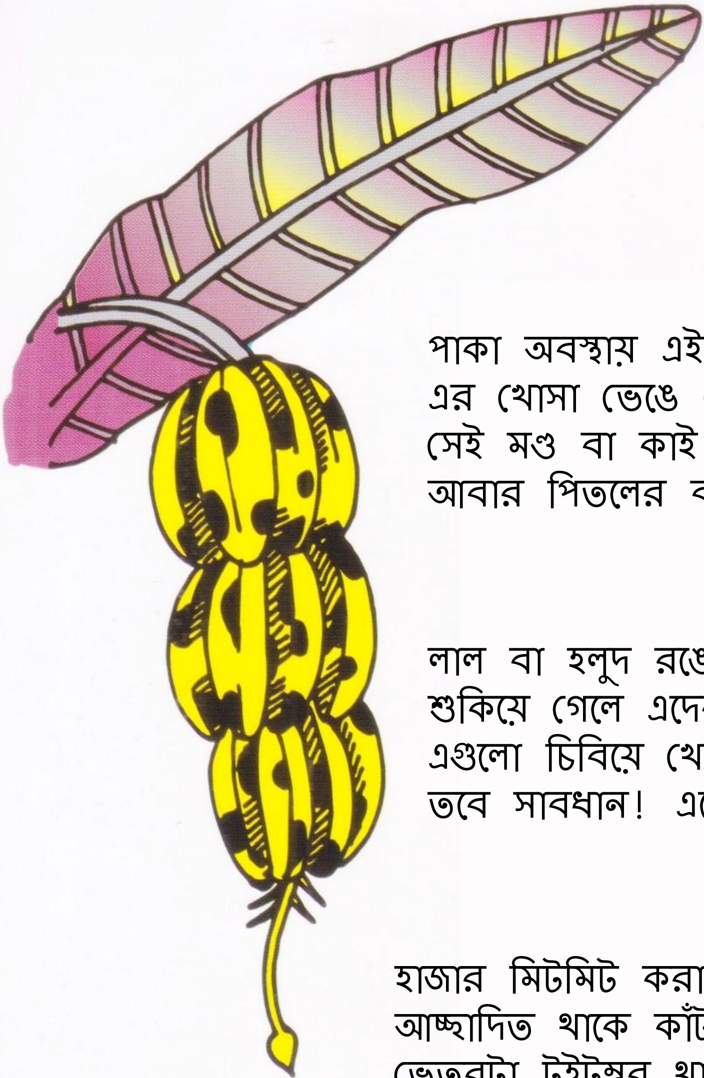
এটি তোমার জিভকে করে দেবে বেগুনি—
আর দাঁতগুলোকে রাঙিয়ে দেবে নীল রঙে!
গাছে থাকা অবস্থায় এটি গাঢ় ও চকচকে দেখায়—
আর শরীরকে জোগায় অজস্র স্বাস্থ্যগুণ।



শক্ত খোসায় মোড়া একটি গোলক—
যার ভেতর ভরা থাকে রসালো প্রকোষ্ঠ।
সেই প্রকোষ্ঠগুলো খাও একে একে—
অথবা ফলটিকে কাটো মাঝখান দিয়ে—
তারপর নিংড়ে বের করে নাও পুষ্টিকর রস।

শিশুরা গাছ থেকে পেড়ে নেয় এই ফল—
তোতাপাখিরা ঠোঁট দিয়ে খুঁড়ে খায় এর ভেতরটা।
এর ভেতর থাকে অসংখ্য ছোট ছোট কুড়মুড়ে বীজ—
সবুজ বা হলুদ রঙের এই ফলের সুবাস বড়ই লোভনীয়।

এর মসৃণ সবুজ খোসায় আঁকা থাকে সুন্দর নকশা—
কাটলেই এটি খুলে যায় ‘কট’ শব্দ করে।
ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে লাল রঙের গোল মুখ—যাতে
থাকে অসংখ্য কালো ছোপ।
এর এক টুকরো খেলেই মনটা হয়ে ওঠে সতেজ।

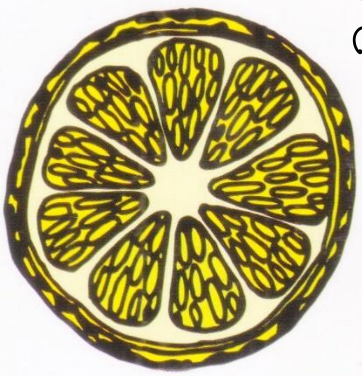


সুঠাম গড়নের একটি গোলাকার ফল—
যা মেলে লাল, সবুজ আর হলুদ রঙে।
ভেতরটা ধবধবে সাদা আর বেশ মচমচে—
কাশ্মীর আর সিমলার মাটিতে এর জন্ম।

পাকা অবস্থায় এই ফলটি হয় টক-মিষ্টি—
এর খোসা ভেঙে ভেতরটা নিতে হয় চটকে।
সেই মণ্ড বা কাই ব্যবহার করা হয় রান্নায়—
আবার পিতলের বাসনপত্র ঝকঝকে করতেও এটি কাজে লাগে।

লাল বা হলুদ রঙের ফলের থোকা—
শুকিয়ে গেলে এদের খোসা হয়ে যায় কুঁচকানো।
এগুলো চিবিয়ে খেতে বেশ সুস্বাদু ও মিষ্টি—
তবে সাবধান! এদের ভেতর লুকিয়ে থাকে শক্ত পাথরের মতো আঁটি!

হাজার মিটমিট করা চোখের ওপর এটি পরে থাকে এক মুকুট—
আচ্ছাদিত থাকে কাঁটাভরা বর্মের আড়ালে।
ভেতরটা টইটম্বুর থাকে আঠালো রসে—
আর মোড়ানো থাকে আঁশযুক্ত আবরণে—
যেন স্বর্গীয় হালুয়ার হাজারো ছোট ছোট গ্রাস!



সবুজ রঙের, কাঁথা-সেলাইয়ের মতো নকশাকাটা এক জ্যাকেটে মোড়া—
যার ভেতর লুকিয়ে থাকে কালো রঙের ডিম্বাকৃতির দানা।
এটি এক অতি সুস্বাদু, মাখনের মতো মোলায়েম ও মিষ্টি ফল।



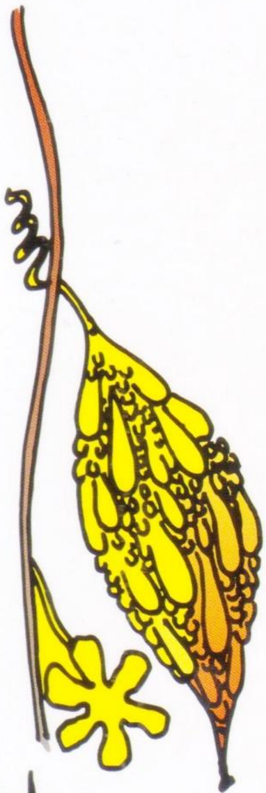
আমার লাল রঙের রত্নভাণ্ডারের ভেতর—
রয়েছে ছোট ছোট হলুদ প্রকোষ্ঠ।
আর সেই প্রকোষ্ঠগুলোর ভেতরেই সযত্নে রাখা আছে—
মূল্যবান লাল রঙের রত্নদানা।

আঙুর, কমলালেবু, আতাফল, জাম, খেজুর, তরমুজ,
পেয়ারা, আপেল, কাঁঠাল, তেঁতুল, আনারস, কলা, ডালিম।



সবুজ ও লম্বা, তোমার আঙুলের মতন
কাটলে মনে হয় যেন পঞ্চভুজ রত্ন
আর সুস্বাদু রাতের খাবার রাঁধতে এর জুড়ি নেই

এর রঙ কমলা
আকৃতিতে এটি মোচাকৃতির
মাটির নিচেই এর জন্ম
আর আমাদের দৃষ্টিশক্তির জন্য এটি খুবই উপকারী



আমি গোল আর সবুজ
আমার শরীরটা ঠাসা থাকে পাতায়
কুচি করে নাও আর ভাপিয়ে নাও
অথবা মচমচে সালাদে কাঁচাই খেয়ে নাও

কাঁটাভরা ডালপালা আর
পাখার মতো কাঁটাযুক্ত পাতা নিয়ে
সাদা, সবুজ কিংবা বেগুনি রঙের এই ডিম্বাকৃতির ফলটি
নিজের মাথায় যেন মুকুট পরে থাকে



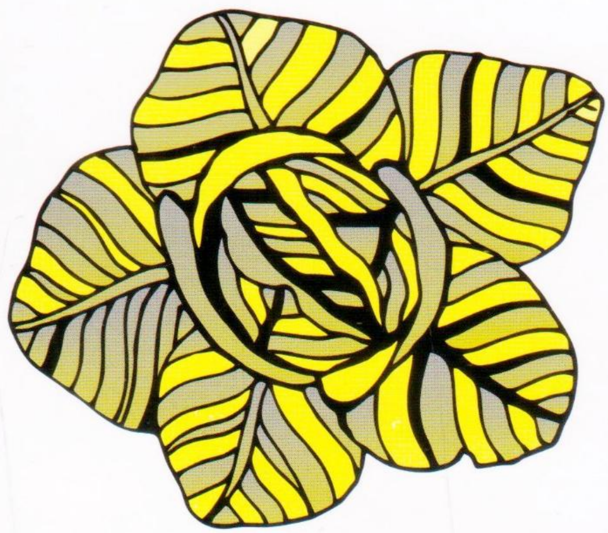
যদি তুমি আমাকে কাটো
তবে আমি তোমাকে কাঁদিয়ে ছাড়ব



এই যে এখানে সবুজ গাছের সারি
কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে ভালো করে ধুয়ে নাও
তৈরি করো এক সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর পদ
আর অপেক্ষা করো—কবে পাতাগুলো আবার গজিয়ে উঠবে

তারার মতো সুন্দর সাদা ফুলের মাঝে
আর পেঁচানো নরম লতানো ডগার ফাঁকে
লম্বা, সাপের মতো এঁকেবেঁকে থাকা ফলগুলো
ঝুলে থাকে মাচার ওপর থেকে!

আমার পাতাগুলো হাতির কানের মতো
আমার মাটির নিচের কন্দগুলো যেন এক-একটা কলসি
মাটির নিচেই তারা লুকিয়ে থাকে
আর তাদের রঙও ঠিক মাটিরই মতো

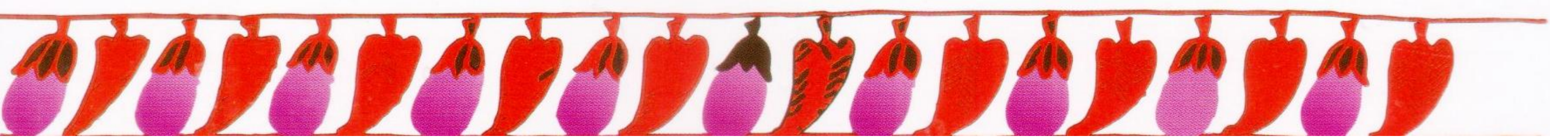


এক লম্বাটে প্রকোষ্ঠের ভেতর
সবুজ মটরদানার এক বিশাল বাহিনী

আমি সবুজ আর ভীষণ তেঁতো
তবে আমি কোনো ওষুধ নই
ছোটরা আমাকে দেখলেই দৌড়ে পালায়
কিন্তু খাবার হিসেবে আমি একদম পরিপূর্ণ

হলুদ ফুলের এক লতানো গাছে আমি বেড়ে উঠি
পাকলে আমি হয়ে উঠি তরমুজের সমান বড়
তবে আমার রঙটা হালকা, ধূসর-সবুজাভ
স্বাদে আমি একদমই পানসে, তবে পেটের জন্য খুবই উপকারী

পালংশাক, চিচিঙ্গা, বেগুন, চালকুমড়া, ঢেঁড়স,
বাঁধাকপি, ওলকচু, গাজর, পেঁয়াজ, মটরশুঁটি, করলা



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane
Artist Uma Krishnaswamy

যে বক্তা কথা বলতে চাইলেন না

মোল্লা নাসিরুদ্দিন ছিলেন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি একজন দক্ষ বক্তাও ছিলেন। তিনি সবসময় মানুষকে হাসাতে পারতেন এবং ভাবাতেও পারতেন।

একবার তাঁর প্রতিবেশীরা মোল্লাকে একটি সভায় বক্তৃতা দেওয়ার অনুরোধ জানালেন। তিনি সেখানে যেতে চাইছিলেন না। মানুষের সাথে মেলামেশা করতে তিনি খুব একটা পছন্দ করতেন না। শেষমেশ তিনি সভায় যেতে রাজি হলেন বটে, কিন্তু বক্তৃতা দেওয়া থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় খুঁজতে লাগলেন।



সেই দিনটি এল। মোল্লা সভাস্থলে উপস্থিত হলেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "আমি এখন যা বলতে চলেছি, তা কি আপনারা সবাই জানেন?"

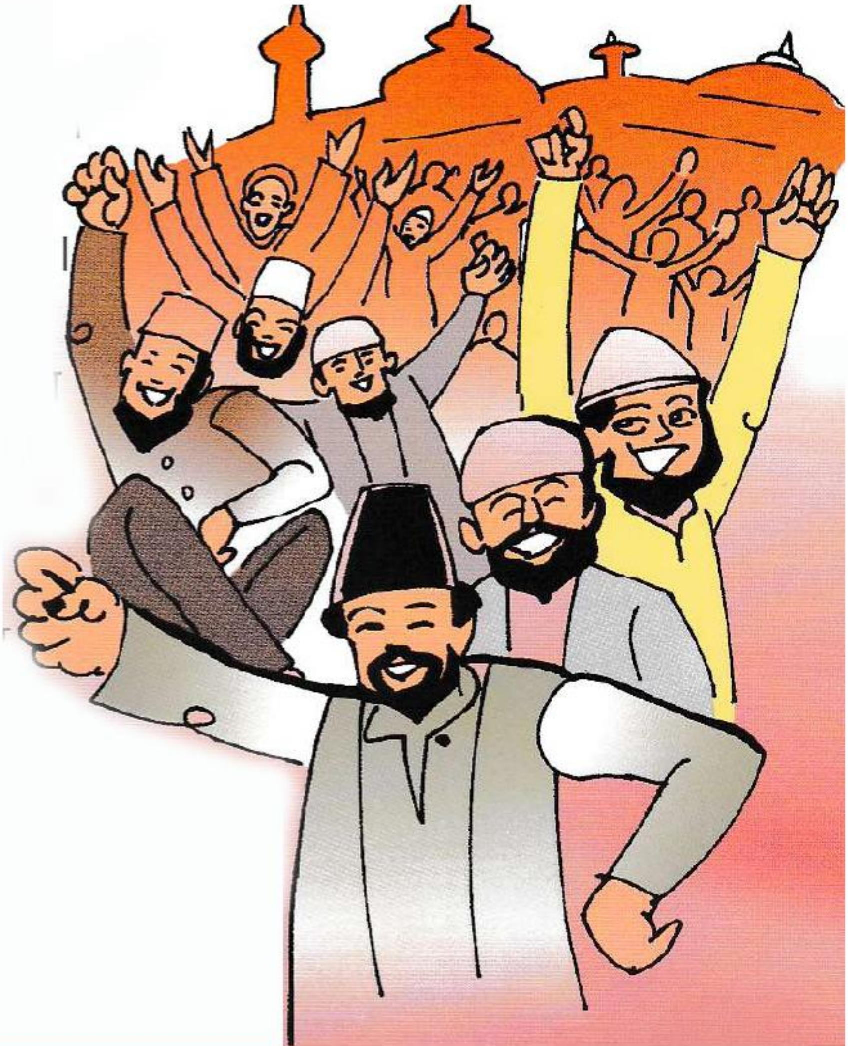
"জানি না... জানি না," সমস্বরে উত্তর এল। এতে মোল্লা ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি বললেন, "যারা কিছুই জানে না, তাদের সামনে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত নই!" এই বলে তিনি বাড়ির পথে রওনা দিলেন।

শ্রোতারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন মোল্লা নাসিরুদ্দিনের পিছু নিলেন। তাঁরা মিনতি করে বললেন, "আমাদের ক্ষমা করুন!" এরপর তাঁরা তাঁকে পরবর্তী সভায় আসার আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি যেতে রাজি হলেন।



মানুষজন মোল্লাকে আর চটাতে চাইছিলেন না। তাই তাঁরা একটি ফন্দি আঁটলেন।

পরবর্তী সভা শুরু হলো। আবার মোল্লা জিজ্ঞেস করলেন, "আমি এখন যা বলতে চলেছি, তা কি আপনারা জানেন?" কিন্তু এবার সবাই সমস্বরে বলে উঠল, "জানি! আমরা জানি!"



মোল্লা জিজ্ঞেস করলেন, "যে বিষয়টি আপনারা আগে থেকেই জানেন, সে সম্পর্কে আমি কেন আর কথা বলতে যাব?" এই বলে তিনি বাড়ির পথে পা বাড়ালেন।

কী দারুণ হতাশা! সভায় উপস্থিত লোকজন আলোচনা করতে লাগলেন—এখন কী করা যায়। তাঁরা একে অপরকে বললেন, "আমরা আমাদের মোল্লার স্বভাব বুঝে গেছি!" আর তাঁরা নতুন আরেকটি পরিকল্পনা করলেন।

পরবর্তী সভা শুরু হলো। মোল্লা জিজ্ঞেস করলেন, "আমি এখন যা বলতে চলেছি, তা কি আপনারা জানেন?" উপস্থিত লোকজনের অর্ধেক বললেন, "আমরা জানি! আমরা জানি!" আর বাকি অর্ধেক বললেন, "আমরা জানি না! আমরা জানি না!"

মোল্লা নাসিরুদ্দিন বললেন, "বেশ তবে!" "যারা জানেন, তাঁরাই বরং যারা জানেন না—তাদের বিষয়টি বুঝিয়ে বলুন!" এই বলে তিনি সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

উপস্থিত জনতা একেবারে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল!



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

ইউকিও ও তিমি

ইউকিও ছিল এক জেলের ছেলে। সে তার মা-বাবার সাথে সমুদ্রের তীরে বাস করত। যখন সে ঘরের কাজ বা পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকত না, তখন সমুদ্রতীরের কাছে থাকা পাথুরে জলাশয়গুলো ঘুরে দেখতে সে খুব ভালোবাসত। সেখানে সে তারামাছ, কাঁকড়া এবং মাঝে মাঝে সামুদ্রিক স্পঞ্জও খুঁজে পেত।

!

একদিন একটি অদ্ভুত শব্দ শুনে ইউকিও এই সব বিস্ময়কর দৃশ্য থেকে অন্য দিকে আকৃষ্ট হলো। শব্দটা কিসের? সে দেখতে গেল। ওই তো! পাথরের মাঝে আটকে পড়া এক বিশাল তিমি বালির ওপর তার লেজ আছড়াচ্ছে। তিমিটি আটকে পড়েছে



"আহা, বেচারা তিমি!" ইউকিও সবিস্ময়ে বলে উঠল। "জল ছাড়া তো তুমি বাঁচতে পারবে না!" সে এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর বলল, "আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি!"

ইউকিও একটি বালতি হাতে নিয়ে সমুদ্রের দিকে দৌড় দিল। সে বালতিটি জলে পূর্ণ করে তিমির কাছে ফিরে এল। সে খুব যত্ন করে তিমির মাথার ওপর জল ঢেলে দিল। সে আবার বালতি ভরে তিমির পিঠের ওপর জল ঢেলে দিল। আবার সে বালতিটি ভরে তিমির লেজের ওপর জল ঢালল।

ইউকিও তিমিটিকে বলল, "তুমি বিশাল বড়, তাতে কী? আমি তোমার জন্য এক হাজার বালতি জল বয়ে আনব!"

সে আবার সমুদ্রের দিকে দৌড়ে গেল। সে বালতি পূর্ণ করল এবং আবার দৌড়ে ফিরে এল। "লেজের জন্য তিন বালতি! পিঠের জন্য চার বালতি! মাথার জন্য পাঁচ বালতি!" অনবরত গুনতে গুনতে ইউকিও জল ঢালতে লাগল। তবুও, তিমির শরীরের কিছু অংশ শুকিয়ে যাচ্ছিল। ইউকিও দৌড়াতে লাগল আর জল ঢালতে লাগল।

হঠাৎ তার শরীরের সব শক্তি ফুরিয়ে গেল। সে বালির ওপর ধপাস করে পড়ে গেল! সে এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে নড়ারও শক্তি ছিল না!



কিন্তু তার মনের ভেতর সেই কথাগুলোই ঘুরপাক খেতে লাগল—"...এক হাজার বালতি জল... এক হাজার বালতি জল..." সে এক লাফে উঠে দাঁড়াল এবং আবার সমুদ্রের দিকে দৌড় দিল। সে আর থামল না, যতক্ষণ না...

"আর দরকার নেই!" ইউকিও চারদিকে তাকাল। ওই তো তার দাদু দাঁড়িয়ে আছেন! আর সাথে গ্রামের আরও অনেক মানুষ!

"তুমি খুব পরিশ্রম করেছ," তার দাদু তাকে বললেন। "এবার বিশ্রাম নাও!" তিনি ইউকিওকে একটি বিশাল পাথরের ছায়ায় নিয়ে গেলেন।



গ্রামের সবাই হাতে পাত্র আর তোয়ালে নিয়ে সেখানে এসেছিল। তারা তাদের পাত্রগুলো জলে পূর্ণ করল এবং তিমির ওপর সেই জল ঢেলে দিল। তারা তোয়ালেগুলো ভিজিয়ে তিমির পিঠের ওপর বিছিয়ে দিল। অবশেষে তিমিটির সারা শরীর ভিজে গেল। কিন্তু গ্রামবাসীরা থামল না। জোয়ার আসা পর্যন্ত তারা অবিরাম কাজ করে চলল।

এখন ঢেউগুলো তিমির লেজ ধুয়ে দিচ্ছিল। ধীরে ধীরে তার শরীর বালুচর থেকে ওপরে উঠে এল। অবশেষে, এক বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ল। সেটি তিমিটিকে পাথরের ওপর দিয়ে তুলে নিয়ে সাগরের গভীরে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

মানুষজন উল্লাস করে উঠল। তারা তিমিটিকে সাঁতরে দূরে চলে যেতে দেখল। তারপর তারা নিজেদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে, হাসতে ও গল্প করতে করতে বাড়ির পথে রওনা হলো। আর ইউকিও? সে তখন তার দাদুর কোলে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

একটি জাপানি গল্প—"আ থাউজেন্ড পেইলস অফ ওয়াটার"

(A Thousand Pails of Water)—থেকে অবলম্বিত।



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

এক দানা চাল

একদা এক সুখী ও সমৃদ্ধশালী রাজ্য ছিল। তার মাটি ছিল অত্যন্ত উর্বর ও ফলনশীল। রাজ্যের হ্রদ ও নদীগুলো স্বচ্ছ জলে কানায় কানায় ভরে থাকত। প্রতি বছর রাজ্যের প্রজারা প্রচুর পরিমাণে ধানের ফসল ফলাত।

প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী, অতিরিক্ত যে ধান বা চাল উৎপাদিত হতো, তা রাজার গুদামঘরে জমা রাখা হতো। দীর্ঘকালের সমৃদ্ধির ফলে গুদামঘরে সঞ্চিত চালের পরিমাণ অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গুদামঘরগুলো তখন পূর্ণ ছিল।

কিন্তু এক বছর বর্ষা এল না। রাজ্যে দুর্ভিক্ষ নেমে এল। রাজার মন্ত্রীরা তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, "মহারাজ, এখন সময় এসেছে গুদামঘরের দরজা খুলে দিয়ে সঞ্চিত চাল প্রজাদের মাঝে বিতরণ করার।"

কিন্তু রাজা তাতে অস্বীকৃতি জানালেন! তিনি প্রশ্ন করলেন, "আমি যদি সব চাল বিলিয়ে দিই, তবে আমার অতিথিদের কী দিয়ে আপ্যায়ন করব?" ফলে প্রজাদের অনাহারেই দিন কাটাতে হলো।



একদিন রাজার সাথে দেখা করতে কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথি এলেন। তাঁদের সম্মানে এক বিশাল ভোজের আয়োজন করা হলো। হাতিদের পিঠে চাপিয়ে ঝুড়ি ভর্তি চাল রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

রানি নামের এক বালিকা হাতিদের সেই শোভাযাত্রাটি দাঁড়িয়ে দেখছিল। হঠাৎ সে লক্ষ্য করল, একটি ঝুড়ি থেকে চাল গড়িয়ে নিচে মাটিতে পড়ছে। ঝুড়িটির এক জায়গায় একটি ছিদ্র ছিল! রানি দৌড়ে গিয়ে নিজের আঁচলে সেই ঝরে পড়া চালের দানাগুলো কুড়িয়ে নিতে লাগল। সে হাতিদের পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকল এবং ঝরে পড়া প্রতিটি দানা যত্ন করে কুড়িয়ে নিল।

শোভাযাত্রাটি রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছাল। সেখানে প্রহরীরা রানিকে থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করল। তারা তাকে জিজ্ঞেস করল, "এত চাল তুমি কোথায় পেলে? এগুলো দিয়ে তুমি কী করবে?"

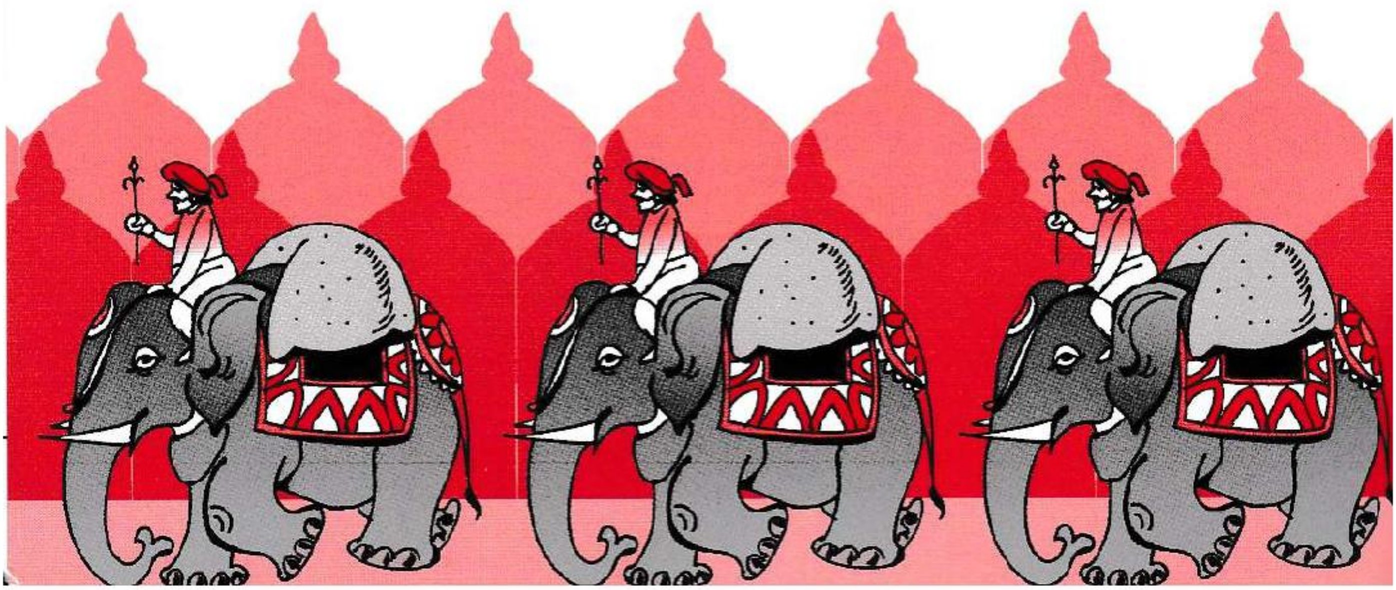
রানি তাদের উত্তর দিল, "একটি ঝুড়ি থেকে চালগুলো গড়িয়ে নিচে পড়ছিল। আমি এগুলো মহারাজকে উপহার দিতে নিয়ে যাচ্ছি।"

রাজাকে বিষয়টি জানানো হলো। তিনি বললেন, "ওই বালিকাটি অত্যন্ত সৎ ও নিষ্ঠাবান। তাকে অবিলম্বে আমার সামনে নিয়ে এসো!" প্রহরীরা রাজার আদেশ পালন করল।

রাজা রানিকে বললেন, "খুকি, তুমি সততা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিয়েছ। আমি তোমাকে পুরস্কৃত করতে চাই। তুমি যা চাইবে, আমি তোমাকে তাই দেব!"

রানি বলল, "আমি কোনো পুরস্কারের আশায় আসিনি। তবে আপনি যদি একান্তই আমাকে কিছু দিতে চান, তবে দয়া করে আমাকে মাত্র 'এক দানা চাল' উপহার দিন। আমার আর কিছুই চাই না!"

রাজা তার মুখের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তিনি বিস্ময়ের সাথে বলে উঠলেন, "কিন্তু আমি তো স্বয়ং মহারাজ! আমি যখন পুরস্কার দেব, তখন তা অবশ্যই বড়সড় কিছু হতে হবে। মাত্র 'এক দানা চাল' তো কোনো পুরস্কারই নয়!"



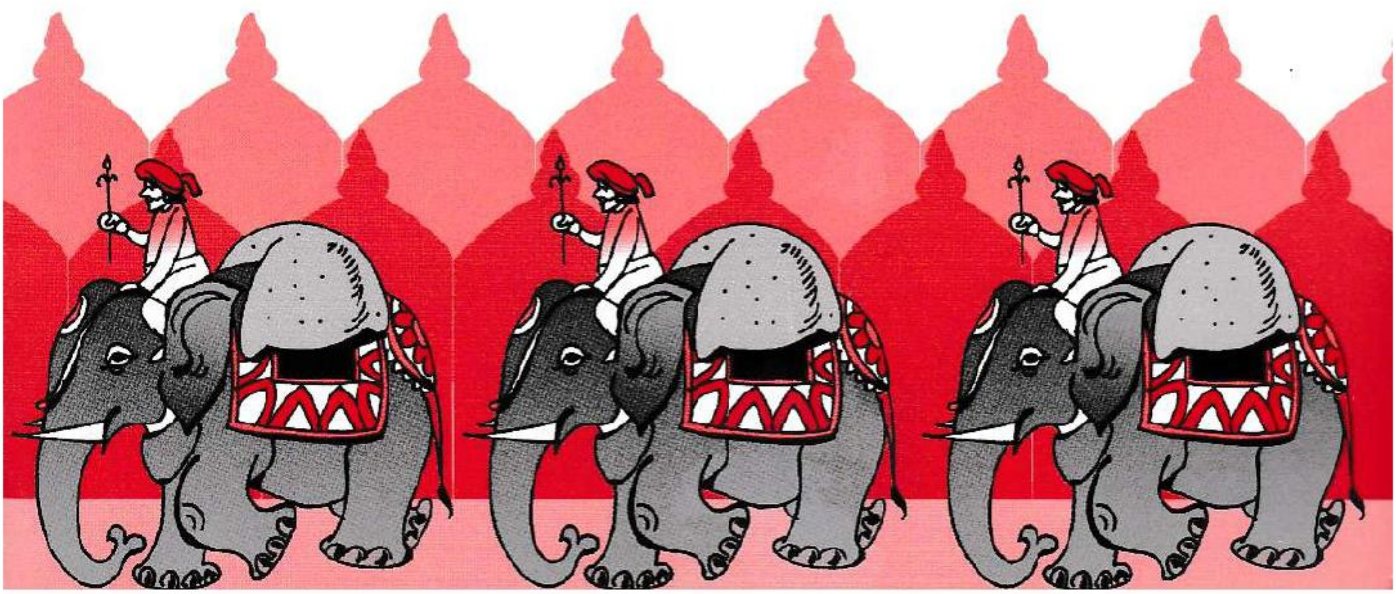
রানি বলল, "তাহলে কি আপনি আমাকে ত্রিশ দিনের জন্য চাল দেবেন? আজ আমাকে এক দানা চাল দিন। কাল আপনি আমাকে দুই দানা দিতে পারেন। আর তার পরের দিন চার দানা। প্রতিদিন আপনি আমাকে আগের দিনের সংখ্যার দ্বিগুণ করে দিতে পারেন।"

"তুমি কি শুধু এটুকুই চাও? তুমি কি নিশ্চিত?" রাজা জিজ্ঞেস করলেন। রানি তার দাবিতে অটল রইল। "এত সামান্য একটি পুরস্কার দেওয়ার সামর্থ্য নিশ্চয়ই আমার আছে," রাজা মনে মনে ভাবলেন। "আমি তোমার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করি!" তিনি রানিকে বললেন।

সেদিন রানি তার সেই এক দানা চাল নিয়ে বাড়ি ফিরল। পরের দিন তার বাড়িতে দুই দানা চাল পৌঁছে দেওয়া হলো। তার পরের দিন এল চার দানা। দশম দিনে নিয়ে আসা হলো ৫১২ দানা চাল। সেটা ছিল মোটামুটি এক মুঠো চালের সমান।

ষোড়শ দিনে রানি পেল দুই ঝুড়ি চাল। তাতে ছিল ৩২,৭৬৮ দানা। সেদিন রাজা মনে মনে ভাবলেন, "আমাকে যে এত বেশি চাল দিতে হবে, তা আমি ভাবতেই পারিনি!" চব্বিশতম দিনে রানি পেল আট ঝুড়ি চাল, যাতে ছিল ৮,৩৮৮,৬০৮ দানা।

সাতাশতম দিনে সে পেল চৌষট্টি ঝুড়ি চাল। এই চাল বত্রিশটি হাতির পিঠে চাপিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। তাতে ছিল ৬৭,১০৮,৮৬৪ দানা।



"চালের পরিমাণ এত দ্রুত কীভাবে বেড়ে গেল?" রাজা চিন্তিত হয়ে ভাবলেন। তিনি আর কত চাল দিতে পারবেন? কিন্তু তিনি তো কথা দিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি কি একটি ছোট মেয়ের চেয়েও কম মর্যাদাবোধের পরিচয় দেবেন?

ত্রিশতম দিনটি এল। দুইশো ছাপ্পান্নটি হাতি ৫৩৬,৮৭০,৯১২ দানা চাল বয়ে নিয়ে রানির বাড়িতে পৌঁছাল।



এখন রাজার শস্যভাণ্ডার একেবারে শূন্য! তিনি রানিকে রাজপ্রাসাদে ডেকে পাঠালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "এত চাল দিয়ে তুমি কী করবে?"

রানি উত্তর দিল, "এই চাল ক্ষুধার্ত মানুষদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া হবে—এমনকি আপনাকেও দেওয়া হবে, মহারাজ! তবে এখন থেকে দয়া করে আপনি কেবল ততটুকু চালই নিজের কাছে রাখবেন, যতটুকু আপনার প্রয়োজন। আপনি কি আমাকে সেই প্রতিশ্রুতি দেবেন?"

রাজার অহংকার চূর্ণ হয়ে গেল! "হ্যাঁ। তুমি যা বলবে, আমি ঠিক তাই করব," তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সব মিলিয়ে রানি মোট কতটুকু চাল পেয়েছিল? ১,০৭৩,৭৪১,৮২৩টি শস্যদানা!

আপনি নিজেই এর সত্যতা যাচাই করে দেখতে পারেন। ৩০ দিনের একটি মাসের ক্যালেন্ডারের পাতা নিন। মাসের প্রথম দিনের ঘরের মধ্যে ১টি শস্যদানা লিখুন। এরপর, দ্বিতীয় দিনের ঘরের মধ্যে ২টি শস্যদানা রাখুন। পরবর্তী ঘরের মধ্যে রাখুন ৪টি শস্যদানা। রানি প্রতিদিন ঠিক কতগুলো করে শস্যদানা পেয়েছিলেন, সেই সংখ্যাটি হিসাব করুন এবং ক্যালেন্ডারের পাতাটি পূরণ করে ফেলুন।

সবকটি ঘরের সংখ্যা যদি আপনি যোগ করেন, তবেই আপনি পেয়ে যাবেন—রাজার কাছ থেকে রানি মোট কতগুলো শস্যদানা পেয়েছিলেন।

একটি ভারতীয় লোককথা

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

Bengali Sriparna Tamhane

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Artist Uma Krishnaswamy

জাদুর নুড়িপাথর



একদা এক বনে একটি ছোট্ট ভালুক তার মা ও বাবার সাথে বাস করত। ছোট্ট ভালুকটি নদীর ধারে খেলতে যেতে খুব ভালোবাসত। পথের মাঝে সে অনেক মজার মজার জিনিস দেখতে পেত—বীজ, পাখির পালক, বড় পাথর আর সুন্দর সুন্দর নুড়িপাথর।

নুড়িপাথরগুলোই ছিল ছোট্ট ভালুকটির সবচেয়ে প্রিয়। বাড়িতে তার নুড়িপাথরের বেশ বড়সড় একটি সংগ্রহই গড়ে উঠেছিল!

একদিন ছোট্ট ভালুকটি এমন একটি নুড়িপাথর খুঁজে পেল, যা সূর্যের আলোয় লালচে আভা ছড়াচ্ছিল। কী দারুণ এক রত্ন! সে পাথরটি কুড়িয়ে নিল এবং পথ চলতে লাগল। হঠাৎ মেঘে সূর্য ঢেকে গেল। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। পথের মাটি কাদাটে হয়ে উঠল। "ইশ, বৃষ্টিটা যদি থেমে যেত!"—ভাবল ছোট্ট ভালুকটি। আর অমনি—চমৎকার! বৃষ্টি থেমে গেল!

"ওহ! আমি তো একটা জাদুর নুড়িপাথর খুঁজে পেয়েছি!"—উপলব্ধি করল ছোট্ট ভালুকটি। "যখনই আমি পাথরটি আমার থাবায় ধরে রাখি, আমার সব ইচ্ছে পূরণ হয়ে যায়!" সে ঘুরে দাঁড়াল—দৌড়ে গিয়ে তার বাবা-মাকে জাদুর নুড়িপাথরটি দেখাবে বলে। কিন্তু বাড়ির পথে ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল এক বিশাল সিংহ! ভয়ে ছোট্ট ভালুকটির শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। তখন সে ভাবল,



"আমি নিজেকে অন্য কোনো রূপে বদলে ফেলতে পারি!

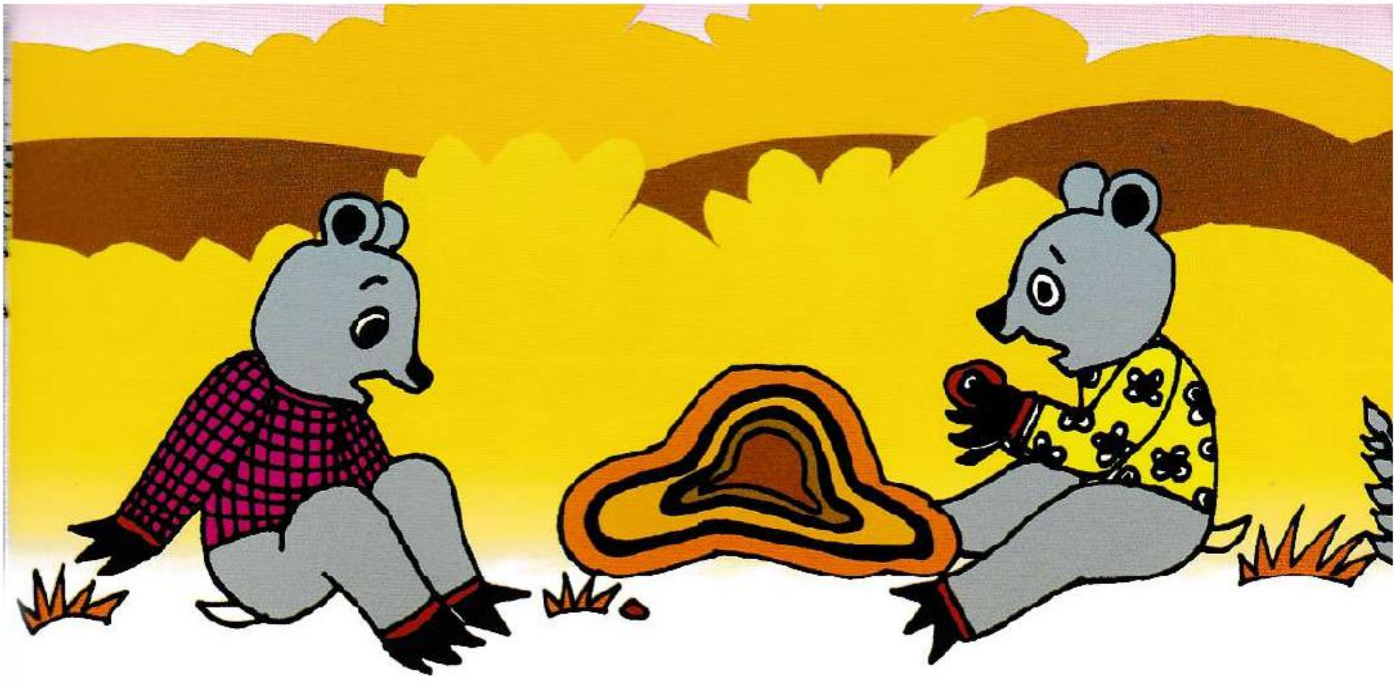
এমন কিছু, যাকে সিংহটা খেতে চাইবে না!" হুম... আহা! "ইশ, আমি যদি একটা পাথর হয়ে যেতে পারতাম!"—সে মনে মনে বলল। আর অমনি—চমৎকার! সে একটি পাথরে রূপান্তরিত হয়ে গেল। ছোট্ট ভালুকটি বেঁচে গেল!

কিন্তু জাদুর নুড়িপাথরটি পথেই পড়ে গিয়েছিল। "ওহ, সর্বনাশ!"—ভাবল ছোট্ট ভালুকটি। "আমি তো এখন পাথরের রূপেই আটকা পড়ে গেলাম!"

এদিকে, ছোট্ট ভালুকটির বাবা-মা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। "প্রায় অন্ধকার হয়ে এল যে! আমাদের বাচ্ছাটা এখনো ফিরে এল না কেন?"—বললেন মা ভালুকটি। তাঁরা দুজনে মিলে বনের এদিক-সেদিক ঘুরে অন্য পশুদের জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, "তোমরা কি কোথাও একটা ছোট্ট ভালুককে দেখেছ?" কিন্তু কেউ-ই তাকে দেখেনি।

প্রতিদিন বাবা ও মা ভালুক বাইরে বেরিয়ে তাদের সন্তানকে খুঁজতে যেতেন। প্রতিদিন তাঁরা সবার কাছে তার খোঁজখবর নিতেন। আহা, বেচারা ভালুক দম্পতি! তাঁরা দিন দিন আরও বেশি বিষণ্ণ হয়ে পড়ছিলেন। তবুও তারা তাদের খোঁজ করা থামালেন না





একদিন বিকেলে, তাঁরা নদীর পথের ধারে পড়ে থাকা একটি বিশাল পাথরের ওপর বসে পড়লেন। "একটু জিরিয়ে নিই," তাঁরা একে অপরকে বললেন—"তারপর আবার পথ চলা শুরু করব।" তাঁরা কী করে জানবেন যে, এই পাথরটিই আসলে তাদেরই অতি আদরের ছোট্ট ভালুকটি!

নিজের বাবা-মাকে দেখে ছোট্ট ভালুকটি ভীষণ—ভীষণ খুশি হয়ে উঠল! কিন্তু সে তো আর তাদের নিজের মনের কথা জানাতে পারছিল না। সে নড়াচড়া করতে পারছিল না, এমনকি মুখ ফুটে কোনো শব্দও করতে পারছিল না। এরপর ছোট্ট ভালুকটির মা পথের ধার থেকে নুড়িপাথর কুড়াতে শুরু করলেন। "আহা, আমাদের বাচ্চাটি যদি এই নুড়িপাথরগুলো দেখতে পেত!" তিনি বললেন। "ও নিশ্চয়ই এগুলো নিজের সংগ্রহের তালিকায় যোগ করতে খুব ভালোবাসত!"

এরপর ছোট্ট ভালুকটির বাবাও এসে তাঁর সাথে যোগ দিলেন। হৃদয়ে অজস্র স্মৃতি নিয়ে তাঁরা এক ডজন সুন্দর নুড়িপাথর কুড়ালেন এবং সেগুলোকে পাথরের ওপর স্তূপ করে রাখলেন। অবশ্যই, সেই নুড়িপাথরগুলোর একটি ছিল বাচ্চা ভালুকটির সেই জাদুর নুড়িপাথর!

ছোট্ট ভালুকটির মা সবকটি নুড়িপাথর গোল করে সাজালেন—ঠিক যেভাবে তাঁর বাচ্চাটি সাজাত। সূর্যের তীব্র আলো পাথরের ওপর এসে পড়ল; সেই তাপে পাথরটি উষ্ণ হয়ে উঠল এবং নুড়িপাথরগুলো চকমক করে উঠল।

আর ঠিক তখনই—জাদু! যেখানে পাথরটি ছিল, সেখানে এখন দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর অতি আদরের বাচ্ছাটি! এতক্ষণ ধরে বাচ্ছা ভালুকটি মনে মনে ভাবছিল, "মা, বাবা—আমিই তো তোমাদের সেই বাচ্ছা! আহা, আমি যদি আবার একটা ভালুক হতে পারতাম!" যেই মুহূর্তে তার মা সেই জাদুর নুড়িপাথরটি পাথরের ওপর রাখলেন, অমনি জাদু কাজ করে বসল!

এখন চারদিকে শুধুই আনন্দের বন্যা। বাচ্ছাটির বাবা-মা তাকে কোলে তুলে নিলেন এবং খুব শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁরা তাকে শূন্যে ছুড়ে ছুড়ে আদর করলেন। বাড়ি ফেরার আগে, তাঁরা তিনজন মিলে দীর্ঘক্ষণ ধরে খেলাধুলা করলেন।

উইলিয়াম স্টেইগ-এর লেখা 'সিলভেস্টার অ্যান্ড দ্য ম্যাজিক পেবল' অবলম্বনে



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

জেলে ও রাক্ষস

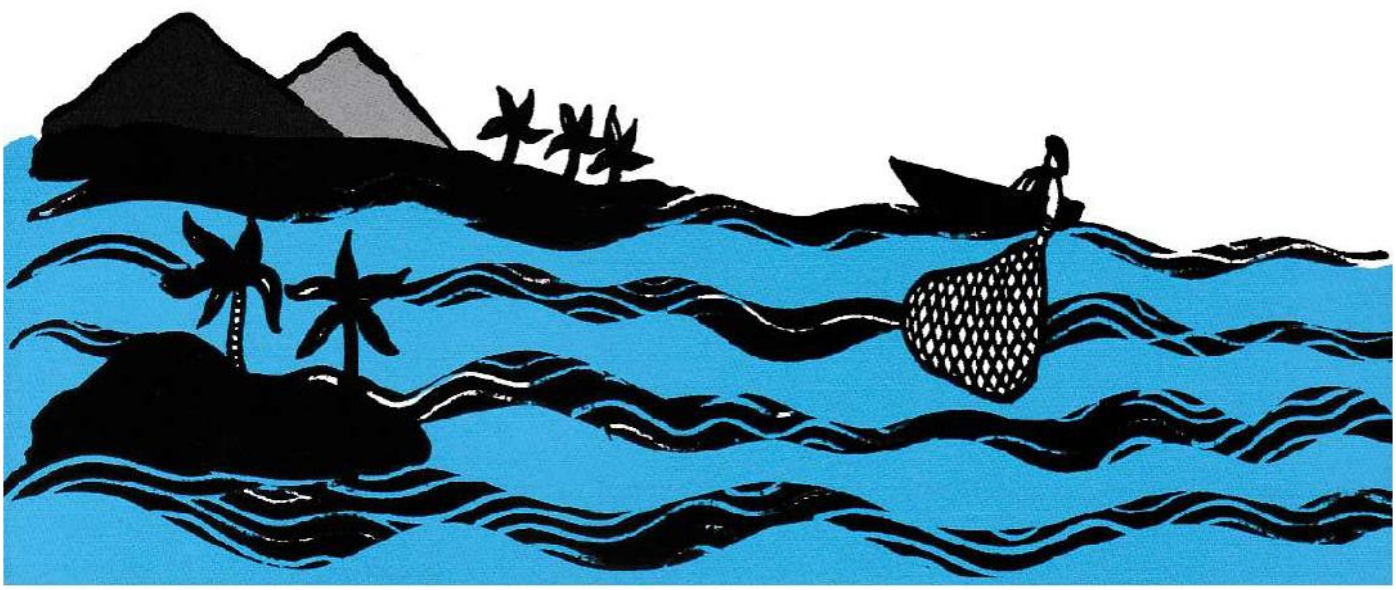
সমুদ্রের ধারে এক গ্রামে এক গরিব জেলে বাস করত। প্রতিদিন ভোরবেলা সে নৌকা বেয়ে সমুদ্রের অনেক গভীরে চলে যেত। সে সবসময় ঠিক ততটুকুই মাছ ধরত, যা দিয়ে তার কোনোমতে দিন গুজরান হয়ে যেত।

এই জেলে তার যৌবনকালে একটি ব্রত নিয়েছিল—সে দিনে ঠিক তিনবারই তার জাল ফেলবে। সেই ব্রত সে গত এতগুলো বছরে একবারও ভঙ্গ করেনি।

আজ তার প্রথম বারের জালে খুব ভারী কিছু একটা উঠে এল। অসীম কষ্টে সে সেটা টেনে নৌকায় তুলল। হায় রে! ওটা ছিল সদ্য নিহত কোনো পশুর মৃতদেহ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে জালটি খুলে দিল এবং মৃতদেহটি আবার জলে ফেলে দিল। দ্বিতীয়বারের মতো জাল ফেলে সে আবার সেই ভারী জালটি নৌকায় তুলতে গিয়ে হিমশিম খেল। এবার জালে আটকে ছিল একটি বিশাল মাটির পাত্র।

পাত্রটির ভেতরে কি সোনা আছে? নাকি রুপোর মুদ্রা? হায়, না! ওটা ছিল পাথর, কাদা আর কাঁচের ছোট ছোট টুকরোয় পূর্ণ।



"হে ঈশ্বর!" জেলেটি আর্তনাদ করে উঠল। "আজ অন্তত একটা মাছ ধরার সুযোগ আমাকে দাও!" এই বলে সে তৃতীয়বারের মতো তার জাল ফেলল।

এবার জালে যা উঠল, তা আগের বারের চেয়েও ভারী ছিল। কী অবাক কাণ্ড! এর ভেতরে ছিল কেবল একটি ছোট পিতলের কলসি। কিন্তু জেলেটি তাতে যারপরনাই খুশি হলো। "এই সুন্দর কলসিটা বিক্রি করেই আজ রাতের খাবারের খরচ উঠে আসবে!" সে মনে মনে ভাবল।

দ্রুত সে নৌকা বেয়ে তীরে ফিরে এল। নৌকা থেকে লাফ দিয়ে সে ডাঙায় উঠল। তারপর কলসিটির মুখ খুলে সে উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকাল।

হঠাৎ কলসির মুখ দিয়ে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। ধোঁয়াটা ধীরে ধীরে আকাশের দিকে উঠতে দেখে জেলেটি ভয়ে পিছিয়ে গেল। জমাট বেঁধে যখন ধোঁয়াটা এক রাক্ষুসে আকৃতি ধারণ করল, তখন সে ভয়ে কাঠ হয়ে সেই দৃশ্য দেখতে লাগল। রাক্ষসটির মাথা গিয়ে ঠেকেছিল মেঘের রাজ্যে! তার চোখগুলো হীরার মতো ঝকমক করছিল! আর তার মুখটা ছিল যেন এক বিশাল গুহা!

জেলেটির হাত-পা থরথর করে কাঁপতে লাগল। বেচারা! সে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল এবং একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

রাক্ষসটি কথা বলে উঠল। "আমি তোকে মেরে ফেলব!" সে গর্জন করে বলল।

"আমাকে?" জেলেটি আর্তনাদ করে উঠল। "কিন্তু আমিই তো তোমাকে ওই কলসি থেকে উদ্ধার করেছি!" "তুমি আমাকে কেন হত্যা করতে চাও?"

"আমি তোমাকে বলব, তবে তারপরই আমি তোমাকে হত্যা করব!" সে উত্তর দিল। "কলসির ভেতর আমার প্রথম একশ বছর," সে বলতে লাগল, "আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, যে কেউ এই কলসিটি খুলবে, আমি তাকে বিপুল ধনসম্পদ দিয়ে পুরস্কৃত করব। কিন্তু কেউ এল না!





"পরবর্তী একশ বছরে, আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আমি তাকে নানারকম উপহার দিয়ে পুরস্কৃত করব। আবারও, কেউ এল না।

"তখন আমি আমার শেষ প্রতিজ্ঞাটি করলাম: যে আমাকে মুক্ত করবে, আমি তাকে মৃত্যু উপহার দেব—কেবল মৃত্যুই!"

"এ কি ন্যায়বিচার?" জেলে জিজ্ঞেস করল, "একটি ভালো কাজের প্রতিদান হিসেবে শাস্তি দেওয়া?" সে দৌড়ে পালাতে চাইল, কিন্তু তার পা আর তার কথা শুনল না। সে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল!

দানবটি জেলের দিকে এগিয়ে এল। সে ধোঁয়ার মতো মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলল—পিছনে পায়ের কোনো ছাপ বা কোনো চিহ্নই রেখে গেল না! মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে তার শিকারের কাছে পৌঁছে যাবে।

জেলেটি মরিয়া হয়ে ভাবতে লাগল। তারপর, একেবারে শেষ মুহূর্তে, সে দানবটির চোখের দিকে সরাসরি তাকাল এবং বলল, "হে শক্তিমান! তুমি কী অসাধারণ! তোমার বিশাল আকৃতি অবিশ্বাস্য—তোমার মাথা যেন আকাশচুম্বী! তোমার পায়ের কড়ে আঙুলের নখটিও তো এই কলসির চেয়ে বড়!"

দানবটি গর্বে ফুলে উঠল।

"তবে একটি প্রশ্ন আমাকে খুব ভাবাচ্ছে," জেলেটি বলে চলল। "তুমি কীভাবে তোমার বিশাল শরীরটা পুরোটা এই কলসির ভেতর আটকালে—সেখানে এত দীর্ঘ সময় ধরে থাকার কথা তো বাদই দিলাম?"

মুহূর্তের মধ্যেই দানবটি বলল, "আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।" সে আকারে ছোট হতে লাগল—আরও ছোট, আরও ছোট। যখন সে যথেষ্ট ছোট হয়ে গেল, তখন সে কলসির ভেতর ঢুকে পড়ল। জেলেটি কলসির ঢাকনাটি খপ করে ধরে ফেলল এবং শক্ত করে আটকে দিল।

"বাঁচাও! বাঁচাও!" দানবটি আর্তনাদ করে উঠল। "আমাকে বের হতে দাও! আমি তোমাকে একজন ধনী মানুষ বানিয়ে দেব!"

কিন্তু জেলে বলল, "আরও এক হাজার বছর ওখানেই বন্দি হয়ে থাকো!" এই বলে সে কলসিটি আবার সমুদ্রের গভীরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। নিজের ক্ষুধার কথা ভুলে গিয়ে সে দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে রওনা হলো। প্রাণে বেঁচে ফিরতে পেরে সে ছিল পরম কৃতজ্ঞ!

'এক হাজার এক আরব্য রজনী' থেকে সংগৃহীত একটি গল্প



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

78 জ্ঞানই সম্পদ

একদা তিন ভাই ছিল। তারা স্কুলে খুব ভালো পড়াশোনা করত এবং বড় হয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিমান হয়ে উঠল। কিন্তু স্কুলের পাঠ শেষ হওয়ার পরেও, জ্ঞানের জন্য তাদের তৃষ্ণা বিন্দুমাত্র মিটলোনা।

তারা তাদের বাবাকে বলল, "আমরা নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ সম্পর্কে জানি। উদ্ভিদ ও প্রাণীরা কীভাবে বেড়ে ওঠে, তা-ও আমাদের জানা আছে। আমরা প্রাচীন সব কাহিনি পড়েছি। এখন আমরা আরও অনেক কিছু শিখতে চাই।"

বাবা উত্তর দিলেন, "বৎসরা, বই পড়ে তোমরা যতটা শেখা সম্ভব, তার সবটাই শিখে ফেলেছ। এখন সময় হয়েছে তোমাদের পৃথিবীটা দেখার!"

তাই ভাইয়েরা তাদের ব্যাগপত্র গুছিয়ে নিল। যখন তারা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলো, বাবা অশ্রুসজল নয়নে তাদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন।



তিনি তাদের হাতে ভ্রমণের খরচ বাবদ কিছু অর্থ তুলে দিলেন। তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন—সবকিছু গভীরভাবে নিরীক্ষণ করতে এবং যা দেখবে, তা মনে রাখতে। এরপর তিনি তাদের আশীর্বাদ জানিয়ে বিদায় দিলেন।

সেই তিন ভাই দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াল। তারা অনেক নতুন বিষয় শিখল। আর তাদের জীবনে ঘটল নানা রোমাঞ্চকর সব ঘটনা!

একবার একটি শুকনো ও ধুলোমাখা পথে তারা এক সিপাহির দেখা পেল...

১ম ভাই: শুভ সকাল, মহাশয়! আপনি কি কোনো উট খুঁজছেন?

২য় ভাই: উটটির কি বাম চোখটি অন্ধ?

৩য় ভাই: উটটির পিঠে কি কোনো নারী চড়েছিলেন?

সিপাহি: থামো! তোমরা আমার উটটিকে কোথায় দেখেছ?

১ম ভাই: মহাশয়, আমরা তো উটটিকে চোখেই দেখিনি!

সিপাহি: তাহলে তোমরা উটটি সম্পর্কে এত কিছু জানলে কীভাবে? মিথ্যুক কোথাকার! চোর সব! আমি তোমাদের রাজার কাছে নিয়ে যাব!

সিপাহি তাদের রাজার বিচারসভায় নিয়ে গেল। সে রাজাকে জানাল যে, ওই ভাইয়েরা তার উটটি সম্পর্কে কত বিস্তারিত তথ্য জানে।

রাজা: যুবকরা! তোমরা দাবি করছ যে আমাদের এই সিপাহির উটটিকে তোমরা চোখেই দেখনি। অথচ উটটি সম্পর্কে তোমরা সব তথ্যই জানো। এর একটা ব্যাখ্যা দাও!

৩ ভাই: মহারাজ! আমরা চোর নই! আমাদের বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞানের মাধ্যমেই আমরা উটটি সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

রাজার সভাসদদের সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

রাজা: বিচারবুদ্ধি আর জ্ঞান, তাই না? বেশ, দেখা যাক!

তিনি তাঁর ভৃত্যদের কানে কানে কিছু নির্দেশ দিলেন। ভৃত্যরা সভা থেকে বেরিয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ পর একটি বিশাল বাক্স কাঁধে করে ফিরে এল। তারা বাক্সটি রাজার সামনে নামিয়ে রাখল।

রাজা: এবার তোমাদের বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ দাও। বলো তো, এই বাক্সের ভেতরে কী আছে?

১ম ভাই: এটি বেশ হালকা ওজনের কিছু একটা।

২য় ভাই: এটি দেখতে গোলাকার। তৃতীয় ভাই: এটি একটি ডালিম!

রাজা বাক্সটি খুললেন।

রাজা: একি! তোমরা কীভাবে তা বুঝতে পারলে?



প্রথম ভাই: আপনার লোকেরা বাক্সটি খুব সহজেই বহন করে আনল, যদিও এটি বেশ বড়। তাই আমি বুঝতে পারলাম যে, এর ভেতরে নিশ্চয়ই হালকা ওজনের কিছু আছে।

দ্বিতীয় ভাই: আমি বাক্সের ভেতর কিছু একটা গড়িয়ে বেড়ানোর শব্দ শুনতে পেলাম। তাই আমি নিশ্চিত হলাম যে, বস্তুটি নিশ্চয়ই গোলাকার।

তৃতীয় ভাই: এই রাজপ্রাসাদের ঠিক বাইরেই একটি ডালিম বাগান রয়েছে। আপনার ভৃত্যরা সেখানে গিয়ে খুব দ্রুতই ফিরে এল। তাই আমি অনুমান করলাম যে, বাক্সটির ভেতরে একটি ডালিমই আছে।

রাজা: সাবাশ! এবার আমাকে সেই উটটির কথা বলো।

প্রথম ভাই: আমি পথের ওপর উটের পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম। তাই আমি বুঝতে পারলাম যে, একটি উট ওই পথ দিয়ে গেছে।

দ্বিতীয় ভাই: পথের ডান পাশে জন্মানো ঘাস ও ঝোপঝাড়গুলো সদ্যই খাওয়া হয়েছে বলে মনে হলো। কিন্তু বাম পাশের ঘাসগুলোতে খাওয়ার কোনো নতুন চিহ্ন ছিল না। তাই আমি অনুমান করলাম যে, উটটির বাম চোখটি অন্ধ।

তৃতীয় ভাই: আমি লক্ষ্য করলাম যে, উটটি পথের পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছিল।

ঠিক তার কাছেই আমি এক নারীর স্যান্ডেলের ছাপ দেখতে পেলাম। তাই আমি অনুমান করলাম যে, একজন নারীই উটটির পিঠে চড়ে আসছিলেন।

রাজসভার সকল সভাসদ হাততালি দিয়ে উঠলেন।

রাজা: হে তরুণগণ, তোমাদের জ্ঞান ও দক্ষতা আমার দেখা অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে অনেক বেশি বিস্ময়কর। তোমরা দয়া করে এখানেই থেকে যাও এবং আমার উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করো!

একটি এশীয় লোককথা

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

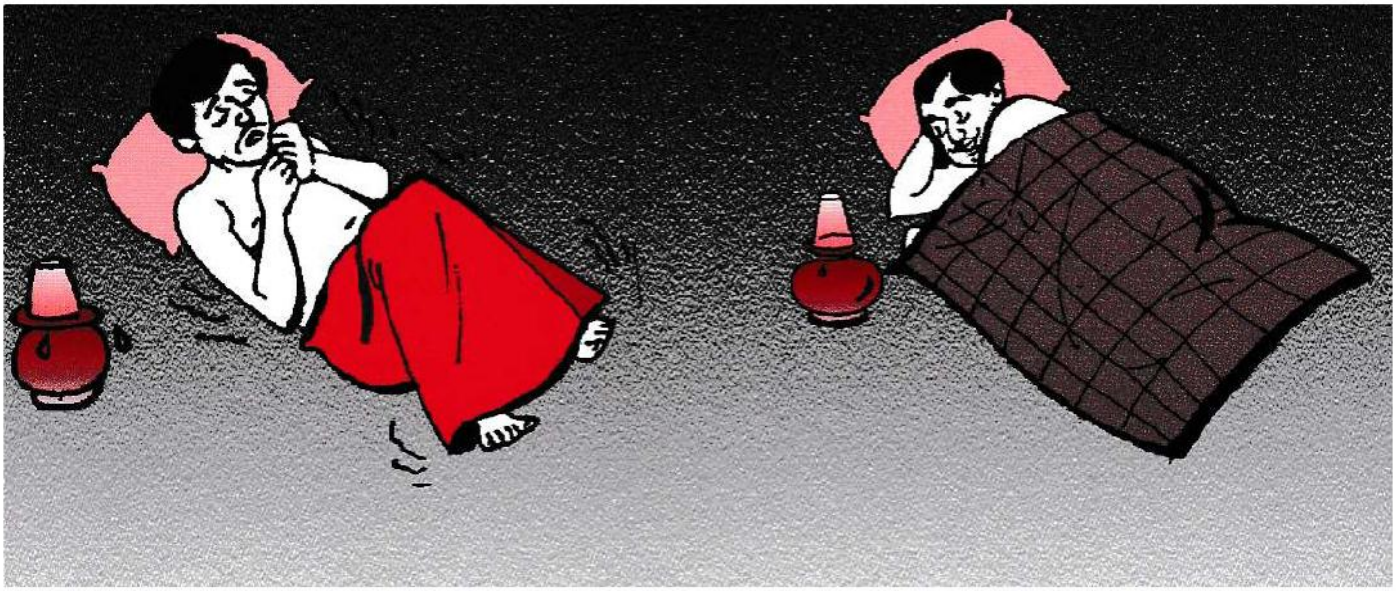
সমান ভাগ

একদা রামু ও সোমু নামে দুই ভাই ছিল। তারা প্রতিবেশী হিসেবে বেশ শান্তিতেই বসবাস করত, কিন্তু একদিন...

সোমু রামুকে বলল, "চলো, আমাদের যা কিছু আছে—গরু, আমগাছ, কম্বল—সবকিছুই আমরা নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে নিই। কী, রাজি তো?" রামু এতে সম্মত হলো।

"বেশ!" সোমু বলল। "গরুটার সামনের দিকটা তুমি নাও, আর আমি নেব পেছনের দিকটা। আমগাছটার নিচের অংশটা তুমি রাখো, আর আমি নেব ওপরের অংশ। আর কম্বলের ব্যাপারে বলি—দিনের বেলা ওটা তুমি ব্যবহার করবে, আর রাতে আমি। রাজি?" সে তার ভাইকে জিজ্ঞেস করল। রামু সরল মনে বলল, "ঠিক আছে, চলো তা-ই করি।"





সেই দিন থেকে রামু গরুকে খাওয়াত, কিন্তু সোমু গরুর দুধ দোহাত এবং সেই দুধ বিক্রি করে দিত। রামু আমগাছে জল দিত, কিন্তু আমগুলো পাড়ত সোমু।

দিনের বেলা কম্বল দিয়ে রামুর কোনো কাজই থাকত না। রাতে সে শীতে কাঁপতে কাঁপতে নিদ্রাহীন রাত কাটাত। পাশেই সোমু কম্বল মুড়ি দিয়ে বেশ আরামদায়ক উষ্ণতায় নিশ্চিন্তে ঘুমাত।

একজন বৃদ্ধ এই পুরো ঘটনাটি লক্ষ্য করলেন। তিনি রামুকে কাছে ডাকলেন এবং তার কানে কানে কী যেন ফিসফিস করে বললেন। ওহ! রামুর মুখের অভিব্যক্তি তখন কতই না বিচিত্র হয়ে উঠল! অবশেষে সে হো হো করে হেসে উঠল এবং দৌড়ে বাড়ি ফিরে গেল।

পরের দিন রামু কম্বলটির ওপর জল ঢেলে দিল। সেই রাতে কম্বলটি তখনও ভেজা ছিল। ফলে সোমু সেটি একদমই ব্যবহার করতে পারল না! সে শীতে কাঁপতে কাঁপতে নিদ্রাহীন রাত কাটাল। সকালে সে রামুকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কম্বলটার ওপর জল ঢেলে দিলে কেন?"

"দিনের বেলা কম্বলটা আমার," রামু বলল। "আমি ওটা দিয়ে যা খুশি তাই করতে পারি!"

সোমু যখন গরুর দুধ দোহাতে শুরু করল, তখন রামু গরুর দড়িটা সজোরে টান দিল। এতে গরুটা রেগে গেল এবং সোমুকে সজোরে লাথি মারল। দুধ সব চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

"তোমার হলোটা কী?!" সোমু চিৎকার করে উঠল। "তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি?"

"গরুটার সামনের দিকটা তো আমার," রামু উত্তর দিল। "আমি যদি দড়িটা টানতে চাই, তাতে তোমার কী বলার আছে?"



সোমু আমগাছটির ছায়ায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। রাগে-ক্ষোভে ক্লান্ত হয়ে সে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। ঠিক তখনই হঠাৎ করে শোনা গেল—"ঠক, ঠক!" কুড়ালের শব্দ ভেসে এল। বিস্ময়ে চোখ মেলে চাইল সোমু। গাছের অন্য পাশে দাঁড়িয়ে ছিল রামু। সে গাছটি কাটতে শুরু করেছিল! "এ তুমি কী করছ?" আর্তনাদ করে উঠল সোমু।

"গাছের গোড়ার অংশটুকু তো আমারই নিজস্ব সম্পত্তি," বলল রামু। "আর আমি সেটাই কাটছি!"

সোমু বুঝতে পারল যে, সে আর তার ভাইকে বোকা বানাতে পারবে না। সেই দিন থেকে তারা দুজনে গরুর দুধ আর আম ভাগ করে নিতে লাগল। সেগুলো বিক্রি করে তারা প্রাপ্ত অর্থ সমানভাগে ভাগ করে নিত। আর কম্বলের ব্যাপারে তারা পালা করে ব্যবহার করত—এক রাতে সোমু ব্যবহার করত, তো পরের রাতে রামু।



P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
Bengali Sriparna Tamhane
Artist Uma Krishnaswamy

৪০ কাঠবিড়ালির ডোরাকাটা দাগ

রাক্ষসরাজ রাবণ ছিলেন এক অত্যন্ত শক্তিশালী রাজা। একদিন তিনি রামের স্ত্রী সীতাকে হরণ করলেন এবং নিজের উড়ন্ত রথে করে তাঁকে নিজের রাজ্য লঙ্কায় নিয়ে গেলেন।

সীতাকে উদ্ধার করতে হলে রামকে সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে! তিনি তাঁর বিশাল ও দুর্ধর্ষ বানর-সেনাবাহিনীকে সাথে নিয়ে সমুদ্রতীরে এসে দাঁড়ালেন। চোখের সামনে সেই বিশাল ও দুর্লঙ্ঘ্য জলরাশির দিকে তাকিয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি সমুদ্ররাজের কাছে সাহায্য চাইবেন।

"আমাদের জন্য সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে একটি পথ খুলে দিন!" রাম মিনতি করে বললেন। কিন্তু সমুদ্ররাজ তাঁর প্রার্থনায় কোনো কর্ণপাত করলেন না। ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে রাম সমুদ্রের জলে তাঁর ঐন্দ্রজালিক বাণ নিক্ষেপ করলেন। ফলে সমুদ্রের সমস্ত মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণী ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে উঠল।

তখন সমুদ্ররাজ ঢেউয়ের বুক চিরে উপরে উঠে এলেন। তিনি রামকে বললেন, "প্রকৃতির প্রতিটি জিনিসেরই নিজস্ব চিরন্তন রূপ ও নিয়ম রয়েছে। আমি কীভাবে আমার অসীম গভীরতা কমিয়ে ফেলব কিংবা আমার ঢেউয়ের চিরন্তন গতিকে থামিয়ে দেব? তার পরিবর্তে, আমি তোমার সেনাবাহিনীকে আমার রাজ্যের ওপর দিয়ে একটি সেতু নির্মাণ করার অনুমতি দিচ্ছি।"



তাই রাম তাঁর সৈন্যদের সেতু নির্মাণের আদেশ দিলেন। সৈন্যরা গিয়ে হাজার হাজার বিশাল বিশাল পাথর ও শিলাখণ্ড সংগ্রহ করে নিয়ে এল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেতুটি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে তারা অবিরাম ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলল।

এই বিশাল কর্মযজ্ঞের মাঝেই একটি কাঠবিড়ালি সেতুর নির্মাণস্থলে এসে উপস্থিত হলো। তার মুখে ছিল অসংখ্য ছোট ছোট নুড়িপাথর। সে অত্যন্ত যত্নসহকারে সেই নুড়িপাথরগুলো বড় বড় শিলাখণ্ডগুলোর মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় বসিয়ে দিচ্ছিল। সে বারবার এদিক-ওদিক ছুটে যাচ্ছিল, সাধ্যমতো যতগুলো সম্ভব নুড়িপাথর সংগ্রহ করছিল এবং সেগুলোকে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে দিচ্ছিল।



রাম যখন কাঠবিড়ালিটির এই অবিরাম কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি মনে মনে ভাবলেন, "ওই ছোট্ট কাঠবিড়ালিটি আসলে কী করছে?"

কিন্তু বানরদের নজরে যখন কাঠবিড়ালিটি এল, তখন তারা তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠল— "এই যে, পুঁচকে! আমাদের সাথে কাজ করার জন্য তুই বড্ড বেশি ছোট আর দুর্বল। এখান থেকে দূর হ!"

কাঠবিড়ালিটি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।



"আমি সেতুটি নির্মাণে সাহায্য করছি," সে বলল।

বানররা তাদের দরাজ কন্ঠে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল এবং কাঠবিড়ালিটিকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতে লাগল। তারা একে অপরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কি এর চেয়ে হাস্যকর কোনো কথা আর কখনও শুনেছ?"

কিন্তু কাঠবিড়ালিটি নিজের কাজের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরল। "ওই বিশাল পাথরগুলো বহন করা আমার সাধ্যের বাইরে। আমি কেবল ছোট ছোট নুড়িপাথরই বহন করতে পারি। তাই আমি সেগুলোই নিয়ে এসেছি। কারণ, সীতাকে উদ্ধারের কাজে আমিও তো সাহায্য করতে চাই।"

বানররা কাঠবিড়ালিটিকে ধাক্কা দিয়ে পথ থেকে সরিয়ে দিল এবং পুনরায় নিজেদের কাজে মন দিল। কিন্তু কাঠবিড়ালিটি অবিরাম নুড়িপাথর সংগ্রহ করে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে সেগুলো বসিয়ে যেতেই থাকল।



এ দৃশ্য দেখে বানরদের একজন ক্ষোভে কাঠবিড়ালিটিকে তুলে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কাঠবিড়ালিটি আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে গেল। "রাম!"—সে আর্তনাদ করে উঠল। যখন সে আবার পৃথিবীর দিকে নেমে আসছিল, রাম তাকে লুফে নিলেন। তিনি তাকে নিজের হাতের তালুতে ধরে রাখলেন। তিনি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে সেটির দিকে তাকালেন।

এরপর তিনি বানরদের নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন, "তোমরা অত্যন্ত শক্তিশালী, আর এই কাঠবিড়ালিটি দুর্বল। কিন্তু প্রত্যেকেই তার নিজস্ব শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে থাকে।

"যারা দুর্বল, তাদের মধ্যেও হয়তো গভীর নিষ্ঠা থাকতে পারে। আমাদের তাদের সাহায্যও প্রয়োজন। আর এ কথা মনে রেখো—বিশাল সব পাথরের ফাঁকে ফাঁকে বসানো ছোট ছোট নুড়িপাথরই আসলে সেতুটিকে আরও বেশি মজবুত করে তোলে।"

রাম কাঠবিড়ালিটিকে নিজের হাতের ওপর ধরে রাখলেন। তিনি পরম স্নেহে সেটির পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। তাঁর সেই ঐশ্বরিক আঙুলগুলোর স্পর্শে কাঠবিড়ালিটির পিঠে তিনটি গাঢ় রেখার ছাপ পড়ে গেল। বলা হয়ে থাকে—সেই ছাপগুলোই হলো সেই ডোরাকাটা দাগ, যা আমরা আজও কাঠবিড়ালিদের পিঠে দেখতে পাই।



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

Bengali Sriparna Tamhane

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Artist Uma Krishnaswamy